ঢেউয়ের তালে ,ভুবন দোলে

পল্লব রায়গুপ্ত
(পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রচারক)
Contact Mail: physics.pallab@gmail.com

লক ডাউন এবং নিউটন :

যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি, সেই সময় বিশ্ব জুড়ে এক মারণ রোগ থাবা বসিয়েছে। করোনা ভাইরাস, যার পোষাকি নাম COVID19 সারা বিশ্বে কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ। ভাইরাস এর আক্রমণ রুখতে সর্বত্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এরকমই এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল 200 বছর আগে, যখন সারা বিশ্ব জুড়ে প্লেগ রোগ ছেয়ে গিয়েছিলো, শয়ে শয়ে মারা যাচ্ছিল আক্রান্ত মানুষ। আর স্কুল, কলেজ বন্ধ করে সব ছাত্র ছাত্রীদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। সালটা ছিল 1665, আইজ্যাক নিউটন তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি ফিরে আসলেন নিজের গ্রামের বাড়ি উলসথ্রপ এ।

(ছবি ১- স্যার আইজাক নিউটনের বাড়ী ,উলসথ্রপ, ইংল্যান্ড)
Photograph: Alamy, The Guardian

অবসর সময় কাটাতে নিউটন সাহেব ভাবতে বসলেন মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ বড় বেশি আকর্ষণ অনুভব করে রাত্রের আকাশে। অসংখ্য ফুটকি ফুটকি আলো ছড়ানো নক্ষত্র রাজি কোন মন্ত্রবলে আটকে আছে একে অপরের সাথে ? যে চাঁদের আলোতে রাতের সব অন্ধ্যকার ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার জোয়ার আসে পৃথিবীতে , সেই চাঁদ ই বা কিভাবে পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলেছে ? এরকমই বিবিধ প্রশ্ন নিউটন কে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলো সারা দিনভর । এরই মাঝে বাগানের আপেল গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ার মত তুচ্ছ ঘটনা নিউটন সাহেব কে এক চরম উপলব্ধির দোর গোঁড়ায় পৌছে দিতে পেরেছিল। নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও গণিতের সাহায্যে নিউটন বললেন এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রত্যেকটি বস্তু কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তিনি আকর্ষণ বলে নাম দিলেন মহাকর্ষ (Gravitation) . এই বলের প্রভাবেই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু এতো সুন্দর ছন্দে একে অপরের সাথে রয়েছে আর ঐ একই বলের জন্য গাছের আপেল মাটিতে এসে পড়েছে। তিনি গণিতের সাহায্যে খুব সহজ ভাবে দেখিয়ে দিলেন এই বল কিভাবে কাজ করে। তিনি দেখালেন এই মহাকর্ষীয় বল বস্তু দুটির গুণ ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ ভারী বস্তুর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল বেশী জোরদার আর এও বললেন এই বল বস্তুদুটির মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব কমলে তাদের মধ্যে টানও বাড়বে হুহু করে আবার

তাদের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে গেলে আকর্ষণ বলও ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই বলের মহিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটন সাহেব তাঁর লেখা বই প্রিন্সিপিয়া তে বললেন যে মহাকর্ষ বল কিভাবে কাজ করে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু কেন দুটি বস্তুর মধ্যে এই বল কাজ করে সেটা আমার জানা নেই এবং সুচারু ভঙ্গিমায় নিউটন সাহেব এই ঘটনার অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির হাত আছে বলে ব্যাখ্যার ইতি টানেন। যদিও সত্য তখন ছিল সুদূর পরাহত। নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাকর্ষীয় বল একটি তাৎক্ষণিক বল। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যাই হোক না কেন তারা একে অপরকে আকর্ষণ করবে কোনো সময় ব্যয় না করেই। এখানেই ;লাগলো খটকা। আমাদের মহাবিশ্বের আকার তো নেহাত মন্দ নয়, যদি বস্তু দুটি মহাবিশ্বের দুপ্রান্তে অবস্থান করে তাহলেও কি তাদের মধ্যেকার আকর্ষণ বল তাৎক্ষণিক হবে? অর্থাৎ কোনো একটি বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে তাৎক্ষনাৎ কি সেই প্রভাব অন্য বস্তুটির ওপর পড়বে?

কাহানি (স্থান-কাল) মে টুইষ্ট :

আইজাক নিউটনের দেওয়া এই মহাকর্ষ বলের রহস্যবৃত অংশ উন্মোচিত হতে সময় লেগে গেলো দুশো বছরের বেশী। আসরে নামলেন ইহুদি জার্মান যুবক আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি ততদিনে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের তত্ত্বের (special theory of relativity)আবিস্কারক হিসেবে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই ছন্দময় মহাবিশ্ব যে সুতোর টানে জুড়ে আছে নিউটন বহিরঙ্গের রূপ বর্ণনা করেছেন মাত্র তার স্বরূপ সন্ধান করা হয়ে ওঠেনি। আর তাই আসরে নামলেন আইনস্টাইন। প্রথমেই তিনি স্থান (space) এবং কাল (time) এই দুটি বিষয়ের ধারণা আমূল ভাবে বদলে দিলেন। তিনি বললেন স্থান ও কাল একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই তারা আলাদা দুটি উপাদান নয়। সময় এমনিতেই বড়ো রহস্যময় জিনিস। নিউটন সাহেব সময়কে যতটা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বলেছিলেন স্থান বা দেশ (space) ও সময় (time) দুটি ভিন্ন রাশি। আইনস্টাইন তা মানলেন না। তিনি বললেন স্থান ও কাল একই বিষয় তারা একে অপরের

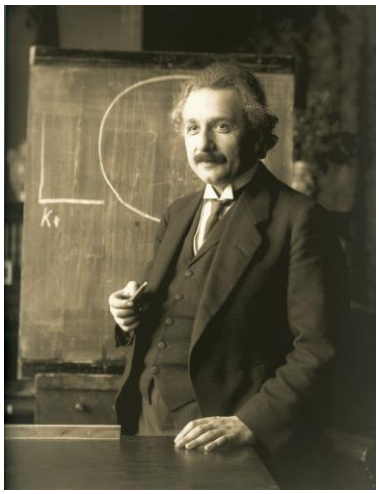

(ছবি ২- আলবার্ট আইনস্টাইন)

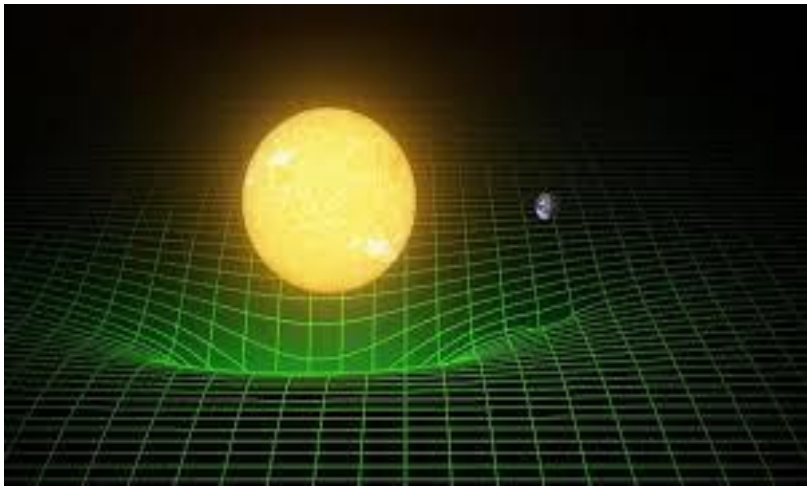

(ছবি ৩- মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র)

ছবি ২ Credit: Albert Einstein Archive, Jerusalem, Ferdinand Schmutzer

ছবি ৩ Credit: T. Pyle/Caltech/MIT/LIGO Lab

আলাদা নয় । তিনি যা বললেন চলো সেটি একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক। ধরা যাক এক ব্যক্তি পৃথিবীর উপর একটি ওজন যন্ত্রে দাঁড়িয়ে নিজের ওজন নিচ্ছে। ওজন যন্ত্রে যে সংখ্যাটি দেখায়, পৃথিবী যে পরিমান বলে ব্যক্তিটিকে নীচের দিকে টানছে বা ব্যাক্তিটি নিজের ওজনের জন্য যে

পরিমান বল যন্ত্রটির উপর প্রয়োগ করছে।এখন ব্যক্তিটি যদি হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে ওঠে তৎক্ষনাৎ ওজন যন্ত্রের কাঁটা ঘুরে গিয়ে শূন্যে নেমে যাবে এবং ব্যাক্তিটি যখন নিচের দিকে নামবে তার নিজেকে ওজন শূন্য মনে হবে। এখন ভাবা যাক ব্যক্তিটি একটি রকেট এ চেপে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। রকেট টির ত্বরণ (Acceleration) যদি ৯.৮ মিটার /সেকেন্ড^২ হয় তাহলেও লোকটির ওজন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নেওয়া ব্যাক্তিটির ওজনের সমান হবে। এক্ষেত্রে রকেটের মেঝে ওই পরিমান বল দিয়ে ব্যাক্তিটিকে উপরের দিকে ঠেলছে তাই ওজন যন্ত্রে ব্যাক্তিটির ওজন অপরিবর্তিত থাকবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তাহলে কি করে বুঝবো যে আমি মহাকাশে নাকি পৃথিবীর মাটিতে আছি? না আমরা সত্যিই বুঝতে পারবোনা। আইনস্টাইন বললেন অবাধে পতন আর শূন্য মহাকাশে বিচরণ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুটোর ক্ষেত্রেই বস্তুটি ওজন শূন্য।

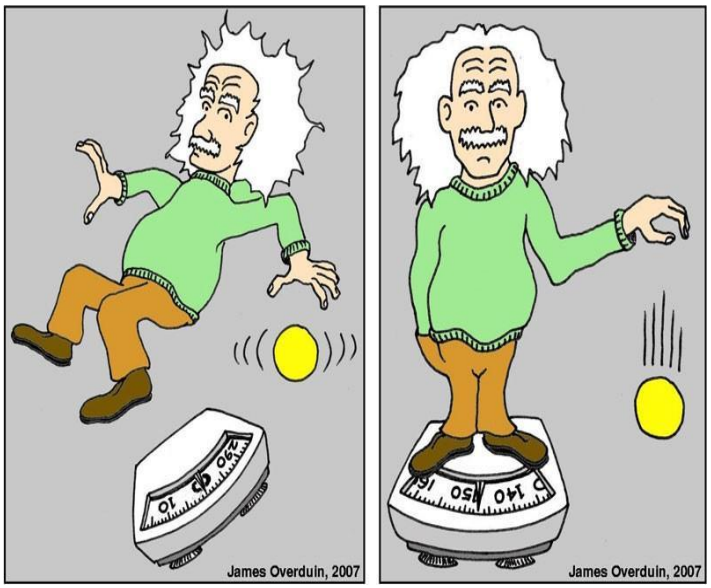

ছবি ৪: ওজন শুন্যতা
Credit: James Overduin, 2007

আর একটু সহজ ভাষায় বললে অবাধে পতনশীল কোনো বস্তু কোনও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল অনুভব করেনা, তার কারণ সত্যিই কোনো বল বস্তুটিকে নীচের দিকে টানছেনা। আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব টি ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল অর্থাৎস্থানের সমসত্বতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। মহাকর্ষ শুধুমাত্র স্থান-কাল বা স্পেস-টাইম এর বক্রতা মাত্র।এবার দেখে নেওয়া যাক মহাকর্ষ কিভাবে সময়ের উপর ছড়ি ঘোরায়। স্থান-কাল একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র। কল্পনার সুবিধার জন্য আমরা এটিকে দুটি আলাদা সুতোয় বোনা একটি কাপড়ের টুকরো ভাবতে পারি।পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় যার পোশাকি নাম স্পেস-টাইম ফেব্রিক। এবার কল্পনা করতে চেষ্টা করো ওই কাপড়টিকে টানটান করে ধরা হলো এবং তার উপর একটি ভারী লোহার বল রেখে দেওয়া হল। তাহলে আমরা দেখবো বলটির ওজনের জন্য কাপড়টি নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। অর্থাৎ বস্তুটি নিজের ভরের জন্য নিজের আশেপাশের স্থান কে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। ঠিক এমনটাই ঘটে গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। গ্রহ বা নক্ষত্র তাদের ভরের জন্য নিজের চারপাশের স্থান-কালের বুনোট কে একদম বাঁকিয়ে ফেলে। এই স্থান-কালের বক্রতা বা স্পেস-টাইম কার্ভেচারকেই (curvature) আমরা মহাকর্ষীয় বল ভাবি। সুতরাং ব্যাপার তাহলে দাঁড়ালো যে মহাকর্ষ কোনো বল নয় এটা শুধুই একটি জ্যামিতিক বক্রতা। এই বক্রতার পরিমাপ ই ঠিক করে দেয় কোনো বস্তুর মহাকর্ষ কত বেশী ,আর এটার সহজ উত্তর হচ্ছে যে বস্তুর ভর যত বেশী সেই বস্তু তত বেশী তার আশপাশের স্থানকে বাঁকিয়ে ফেলে আর তাই যত ভারী বস্তু তার মহাকর্ষের পরিমাণও তত বেশী।

সময় জব্দ, ঘড়ি স্তব্ধ :

আচ্ছা বলছি তো বটে স্পেস ও টাইম যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাদের আলাদা করা যায়না তার প্রমান কি? আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর অবস্থানের জন্য যদি স্পেস দুমড়ে মুচড়ে যাই তাহলে তো সময়ের ও নিষ্কৃতি নাই ,সময়ও বিকৃত হবে। বাস্তবে ঘটেও ঠিক তাই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মহাকাশে রাখা কোনো ঘড়ির তুলনায় পৃথিবীর মাটিতে রাখা কোনো ঘড়ির কাঁটার গতি কিছুটা হলেও শ্লথ যায় । অর্থাৎ মহাকর্ষের উৎসস্থলের যত কাছে যাওয়া যায় ঘড়ির কাঁটার গতি তত কমে। আর তাই পৃথিবীর মাটিতে রাখা ঘড়িটি স্লো চলে। তাহলেই বোঝো মহাকর্ষ কিভাবে সময়কেও জব্দ করতে পারে। স্বভাবতই মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দেয় তাহলেকি এমন কোনো স্থান আছে যেখানে গেলে ঘড়ির কাঁটা একদম স্থির হয়ে যাবে ?

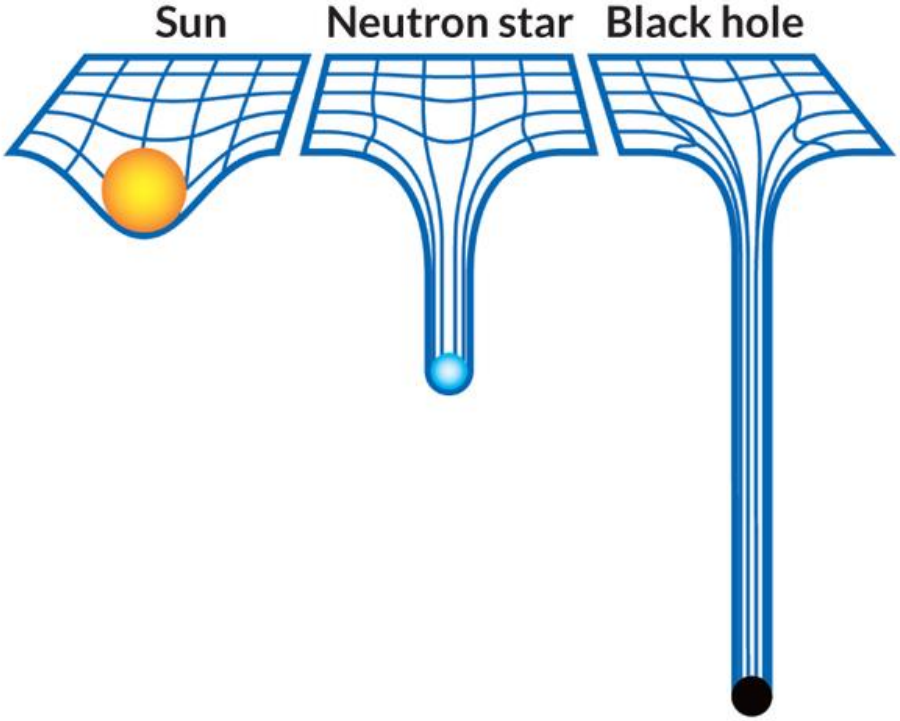

ছবি ৫- স্থান-কালের বক্রতা
Credit: www.sciencenews.org

" ভাবো ,ভাবো ভাবা প্র্যাক্টিস করো। " যে বস্তুর ভর যত বেশী সে তার আশপাশের ক্ষেত্রকে বেশি বাঁকিয়ে ফেলে।এই মহাবিশ্বে ব্লাকহোল হলো একটি বস্তু যার ঘনত্ব অসীম আর তাই তার ভর ও হয়ে যায় কল্পনাতীত। ব্ল্যাকহোলে তার আশপাশের ক্ষেত্রকে এতটাই বাঁকিয়ে ফেলে যে আলোও সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পায়না। এহেন ব্ল্যাকহোলের আসেপাশে থাকা কোনো ঘড়ির কাঁটার যে কি দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়। ঘড়ির কাঁটাও যাবে স্তব্ধ হয়ে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ব্লকহোলে পড়ে গেলে তার জন্য সময় কিন্তু স্থির থাকবে। ভাবতে যতই অবাক লাগুক না কেন এটাই সত্যি।

ওই আঁকা বাঁকা পথটি ধরে :

এবার আর একটু কল্পনা করে দেখ ঐ বেঁকে যাওয়া রবারের চাদরের উপর যাচ্ছি আর একটি ছোট বলকে গড়িয়ে দিই তাহলে বলটি ঐ ভারী বলটিকে কেন্দ্র করে গোল করে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মধ্যে খানে পড়ে যাবে। এই ঘটনা থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে ছোট বলটির চলার পথটাই বেঁকে যাওয়ার কারনে বলটিকেও ঐ বাঁকা ক্ষেত্রে ঘুরতে হয়েছে এছাড়া তার কাছে অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। তাহলে এই পরীক্ষা থেকে সহজভাবে অনুমান করা যায় সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলি এরকম ঘুরপাক খাই কেন। তার কারণ গ্রহগুলি চলার পথটাই সূর্যের ভরের জন্যে বেঁকে গেছে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বটিকে সহজ করে বলতে গিয়ে আর এক বিদিগ্ধ বিজ্ঞানী ও সুবক্তা জন হুইলার বলেন " কোন বস্তুর তার আসে পাশের ক্ষেত্রকে বলে দেয় কতটা বাঁকতে হবে আর ক্ষেত্র বলে দেয় বস্তুকে বল কোন পথে চলতে হবে। "

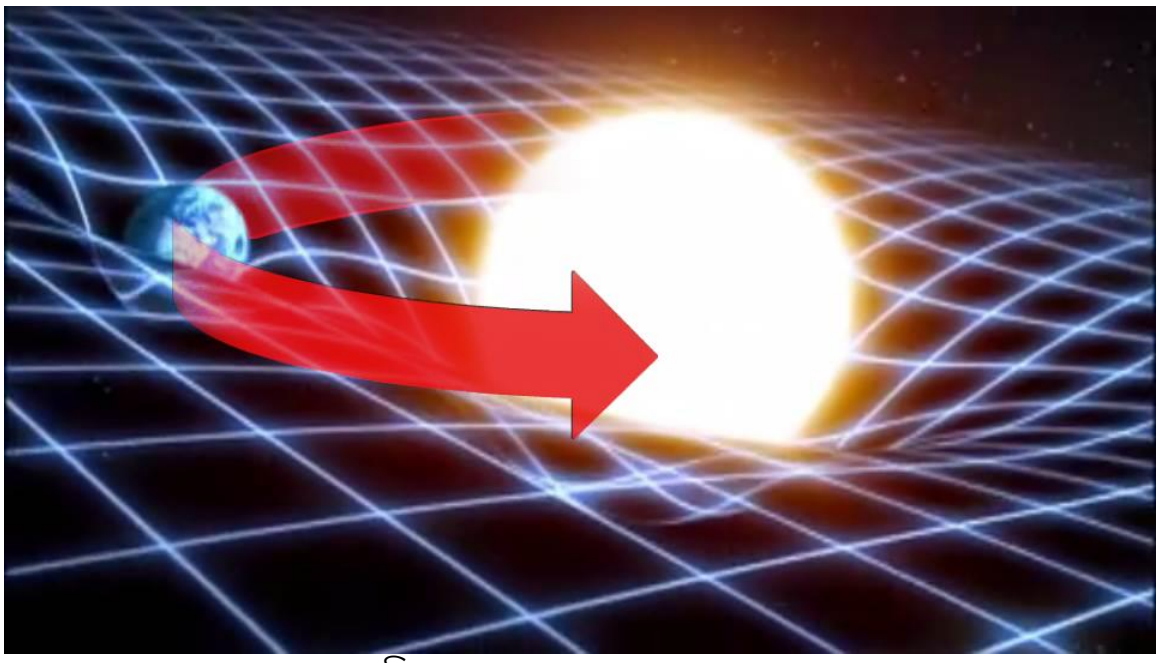

ছবি ৬ Credit: WGBH Boston

১৯১৬ সালে প্রকাশিত হল, মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের চমকপ্রদ আবিষ্কার যা মহাকর্ষ সম্পর্কে এতদিনের ধ্যান ধারণা কে নিমেষে নস্যাৎ করেদিল। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো। এতো আর যে সে ব্যাপার নয় , এ একেবারে বিজ্ঞানের একছত্র সম্রাটের সঙ্গে দ্বৈরথ। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বিজ্ঞানী মহল খুব সহজে স্বীকৃতি দেয়নি।

প্রথম স্বীকৃতি এসেছিল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনের হাত ধরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার মাঝে এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উঠেপড়ে লেগেছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানীর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক মহাকাব্যের সমান। আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো ভারী নক্ষত্রের ভরের কারণে তার আশপাশের ক্ষেত্র এতটাই বেঁকে যায় যে আলো আর সোজা পথে আসতে পারেনা , অনুসরণ করতে হয় বাঁকা পথ। আর তাই সূর্যের পাশ দিয়ে কোনো আলো আসার সময় বেঁকে যায়।

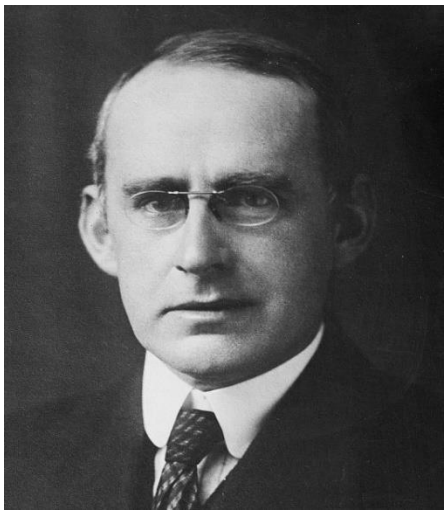

ছবি ৭- স্যার আর্থার এডিংটন

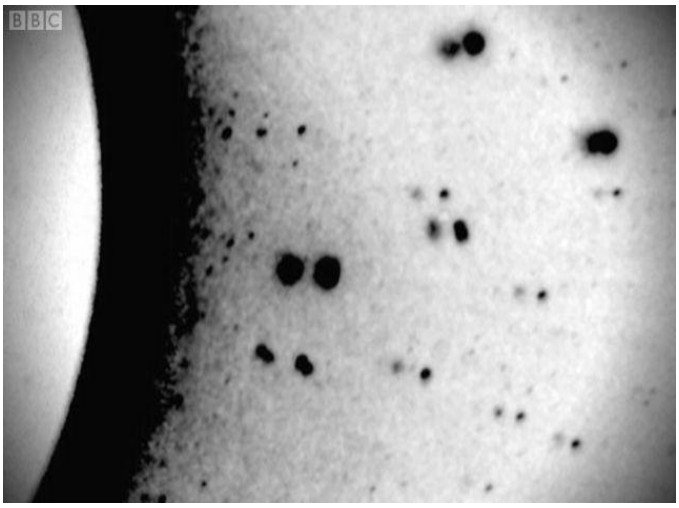

ছবি ৮- এডিংটনের তোলা ছবি যা থেকে রিলেটিভিটির সত্যতা প্রমান হয়েছিল

ছবি ৭ Credit: United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID ggbain.38064
ছবি ৮ Credit: Comparison between Principe plate W and Oxford plate D, from page 324 of Eddington's 1920 paper

এই বক্তব্যের সত্যতা বিচারের জন্যেই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে ২৯ শে মে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের ছবি তুলে প্রমাণ করলেন সত্যি সত্যি সূর্যের পাস দিয়ে আসার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। স্বীকৃতি পেলো আইনস্টাইনের তত্ত্ব , বিজ্ঞান এগিয়ে চললো নিজের গতিতে।

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে .....

আজ কিন্তু অন্য আরেকটা পরীক্ষার গল্প করতে বসেছি তোমাদের সাথে, যা আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির তত্ত্ব কে সরাসরি প্রমান করে । এই প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছিলাম স্পেস হলো পাতলা একটা চাদর বা কাপড়ের মত। কোনো ভারী বস্তুর জন্য যেমন বেঁকে যায় ঠিক তেমনই মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি ভারী বস্তু যদি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা স্পেস কে আন্দোলিত করে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে তা সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনই মহাজাগতিক কোনো সংঘর্ষ বা কোনো নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে স্পেসে ওই একই রকম এই রকম তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই মহাজাগতিক তরঙ্গের নাম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বা গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ। কি অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ভেবে দেখোতো ,মহাবিশ্বের কোনো সুদূর প্রান্তের কোনো খবর ছড়িয়ে পড়ছে তরঙ্গের আকারে ঠিক যেন মহাবিশ্বের মহাসংগীতের সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে বিপুল লহরী তুলে। তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো , মাধ্যম নিজেই এখানে পোস্টম্যান।অর্থাৎ মাধ্যম (স্পেস) নিজেই আন্দোলিত হয় আর ওই ঢেউ ছড়িয়ে পরে চারিদিকে আলোর গতিতে। সুদূর মহাবিশ্বের কোনো এক কোণে ব্ল্যাক হোলের মতো দুটি ভীষণ ভারী বস্তু যদি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় কিংবা সুপারনোভা বিস্ফোরণের মতো কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে তার খবর আলোর গতিতে ছড়িয়ে পরে সমগ্র মহাবিশ্বে।

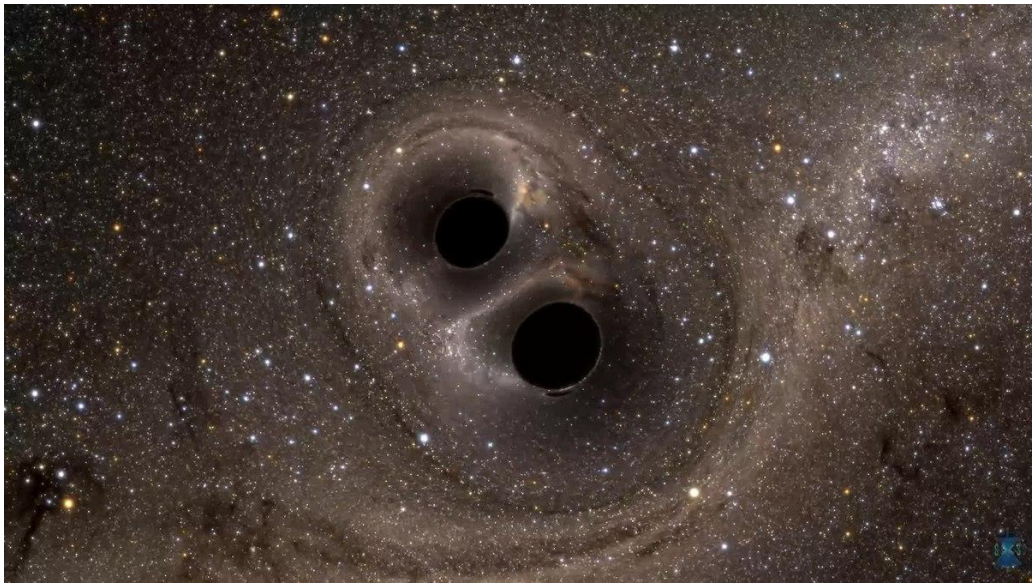

ছবি ৯- দুটি নৃত্যরত ব্ল্যাক হোল
LIGO's gravitational-wave detection is the first direct observation of such a merger.
Credit: SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) project

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন কোনো বস্তুর ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন সেই বস্তুটি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই সংকোচন প্রসারণ দেখেই অনুমান করা সম্ভব হয় যে বস্তুটির ওপর দিয়ে কোনো তরঙ্গ বয়ে গেলো। আবার এটা অনুমান করে নিতেও আমাদের কষ্ট হবে না যে স্পেস নিজেই যদি সংকুচিত ও প্রসারিত হয় তাহলে স্পেস এ থাকা যে কোনো কিছুরই সংকোচন প্রসারণ হবে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এই মহাকর্ষীয় ঢেউয়ের তালে তালে কোনো বস্তুর নাচন কে ধরতে পারলেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যাবে। যেই না ভাবা ওমনি কাজ শুরু।

ইতিহাসের পাতা উল্টে :

আইনস্টাইনের কষা অংকে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ এর উপস্থিতি যতটা সহজে এসেছিলো বাস্তবে পরীক্ষাগারে তার উপস্থিতি প্রমান করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগে গেলো একশো বছর। শুরুটা হয়েছিল ১৯৬০ সালে। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপক জোসেফ ওয়েবার একটি যন্ত্র বানালেন, যার নাম দিলেন ওয়েবার বার্স, যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রমানের প্রথম যন্ত্র হিসাবে ধরা হয়। আচ্ছা ওয়েবার এর যন্ত্রটি কেমন ছিল তা দেখে নেওয়া যাক। ওয়েবারের তৈরী যন্ত্রটিতে দুটি দুইমিটারলম্বা ও এক মিটার ব্যাস যুক্ত দুটি এলুমিনিউম সিলিন্ডার। ওয়েবার ধারণা করেছিলেন যে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন এই সিলিন্ডার দুটির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে তাতে অনুরনণের (Resonance) সৃষ্টি হবে। কিন্তু ওয়েবারের যন্ত্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপিস্থিতি প্রমানে ব্যর্থ হয়।

ছবি ১০- বিজ্ঞানী ওয়েবার তার যন্ত্রের সাথে
Credit: Special Collections and University Archives, University of Maryland Libraries

লাইগো (লেসার ইন্টারফেরোমেট্রি গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অব্জারভেটরি)...

ম্যাসাচুয়েটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী রেইনার ওইস তার ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর ফাঁকে হঠাৎ ই আলোর ইন্টারফেরেন্স বা ব্যাতিচারের বৈশিষ্টকে কাজে লাগিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আব্বিষ্কারের যন্ত্র বানানো যায় তার একটি নক্সা বানিয়ে ফেলেন। ১৯৬৭ সালে এ বিষয়ে একটি পেপার ও লিখে ফেললেন তিনি। যদিও শুরুতে সরকারি সাহায্যের অভাবে এই প্রজেক্ট হোঁচট খায়। এরপর ১৯৯৪ সাল নাগাদ ক্যালটেক - এর বিজ্ঞানী কিপ থর্ন ও প্রফেসর ব্যারি ব্যারিশ এবং সর্বোপরি ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন -এর সহযোগিতায় শুরু হয় লাইগোর যাত্রা। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার হ্যানফোর্ড অঞ্চলে ও ১৯৯৫ সালে লস এঞ্জেলস এর লিভিংস্টোনে স্থাপিত হলো দুটি ডিটেক্টর যন্ত্র। প্রফেশর ব্যারি ব্যারিশ কে এই কর্মকান্ডের প্রথম প্রধান বিজ্ঞান অন্বেষী (Principal investigator) নিযুক্ত করা হলো।

ছবি ১১- লাইগো
Credit: Left - The Virgo Collaboration/CCO 1.0,
Right - Caltech/MIT/LIGO Lab

কিভাবে কাজ করে ইন্টারফেরোমিটার ...

হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী যারা মোটামুটি ভাবে আলোর ব্যতিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটু হলেও পরিচিত তারা সহজেই এই যন্ত্রটির কর্ম পদ্ধতি একটু হলেও ধরতে পারবেন। আমরা জানি কোনো একটি উৎস

থেকে আলো তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি দুটি তরঙ্গ একে ওপরের সঙ্গে মিশলে তরঙ্গের উপরিপাত হয়। ঠিক যেমন পুকুরের জলে পাশাপাশি দুটো ঢিল ফেললে একটা তরঙ্গ আরেকটি তরঙ্গের সাথে মিশে উপরিপাত বা ব্যতিচার ঘটে।

ছবি ১২- জলের তরঙ্গের উপরিপাত
Credit: Paul Doherty

আমরা এটাও শিখেছি দুটি তরঙ্গ সমদশায় (same phase) একে ওপরের উপর মিশলে পরিণতিস্বরূপ তরঙ্গের অ্যামপ্লিচুড বা বিস্তার বেড়ে যায় একে বলা হয় গঠনমূলক উপরিপাত (Constructive Interference)।

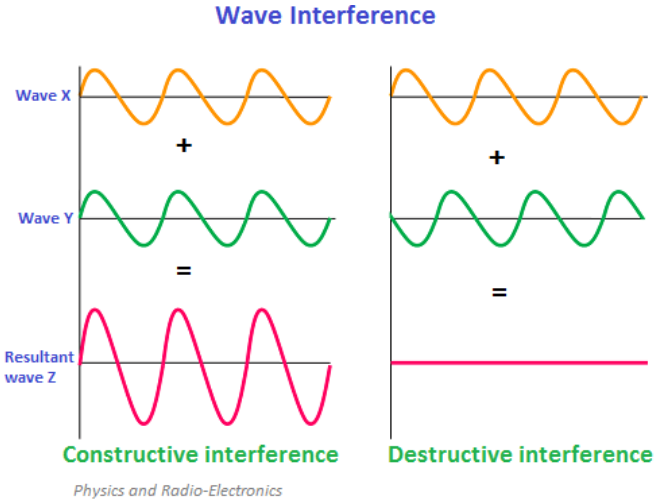

Credit: Physics and Radio Electronics

ছবি ১৩- ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট এ আলোর উপরিপাত
Credit: Pallab Roygupta

এক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটি যদি আলোর হয় তাহলে যেখানে তারা সম দশায় আপতিত হয় সেখানে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায় আর বিপরীত দশায় (Oposite Phase) মিশলে সেখানে তীব্রতা কমে গিয়ে অন্ধকারের সৃষ্টি হয় ,এই পরিস্থিতি কে বলে ধ্বংসাত্মক উপরিপাত (Destructive Interference)। এই পর্যন্ত আমরা মোটামুটি ভাবে জানি। এবার দেখা যাক এই যন্ত্র কিভাবে কাজ করে?

এই যন্ত্রটি ইংরেজি 'L' এর মতো দেখতে দুটি বাহু চার কিলোমিটার লম্বা দুটি টানেল। টানেল দুটিকে সম্পূর্ণভাবে বায়ুশূন্য রাখা হয়। টানেল দুটি যেখানে একে অপরের সাথে মিশছে সেখানে একটি উৎস থেকে লেসার রশ্মিকে বীম স্প্লিটারের সাহায্যে সমকোণে বিভক্ত করে যন্ত্রের দুটি বাহুতে পাঠানো হয়। টানেল দুটির শেষ প্রান্তে রাখা আছে দুটি আয়না। লেসার রশ্মি আয়না তে প্রতিফলিত হয়ে হয়ে ফিরে আসে ও ডিটেক্টর যন্ত্রে একে ওপরের সাথে বিপরীত দশায় আপতিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় ডিটেক্টর যন্ত্রে একটি কালো অংশের সৃষ্টি হওয়া উচিত যদিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে যন্ত্রে ইন্‌ফ্রারেড লেসার রশ্মি ব্যবহার হয় তাই ডিটেক্টর যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়েনা। কিন্তু ধরো যদি কোনো কারণে যদি লেসার রশ্মির বাহুর দৈর্ঘ্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটে তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি দুটি আর কিন্তু একে অপরের সাথে বিপরীত দশায় মিলিত হতে পারবেনা। আর তার ফলেই ডিটেক্টর যন্ত্রে সূক্ষ্ম হলেও কোনো পরিবর্তন ধরা পড়বে। কোনো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে লেসার রশ্মির দৈর্ঘেরও সংকোচন , প্রসারণ হবে, আর তার ফলেই প্রতিফলিত রশ্মি দুটি আর একদম বিপরীত দশায় মিলিত হতে পারবেনা। ফল স্বরূপ ডিটেক্টর যন্ত্রে আলোর সিগন্যাল ধরা পড়বে। আর ঠিক এভাবেই কাজ করে এই লেসার ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রটি।

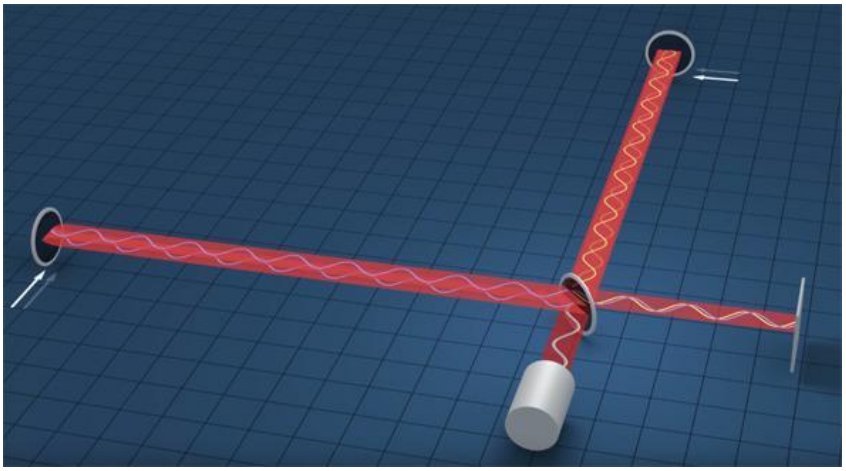

Credit: Courtesy of North-western University (A Britannica Publishing Partner)

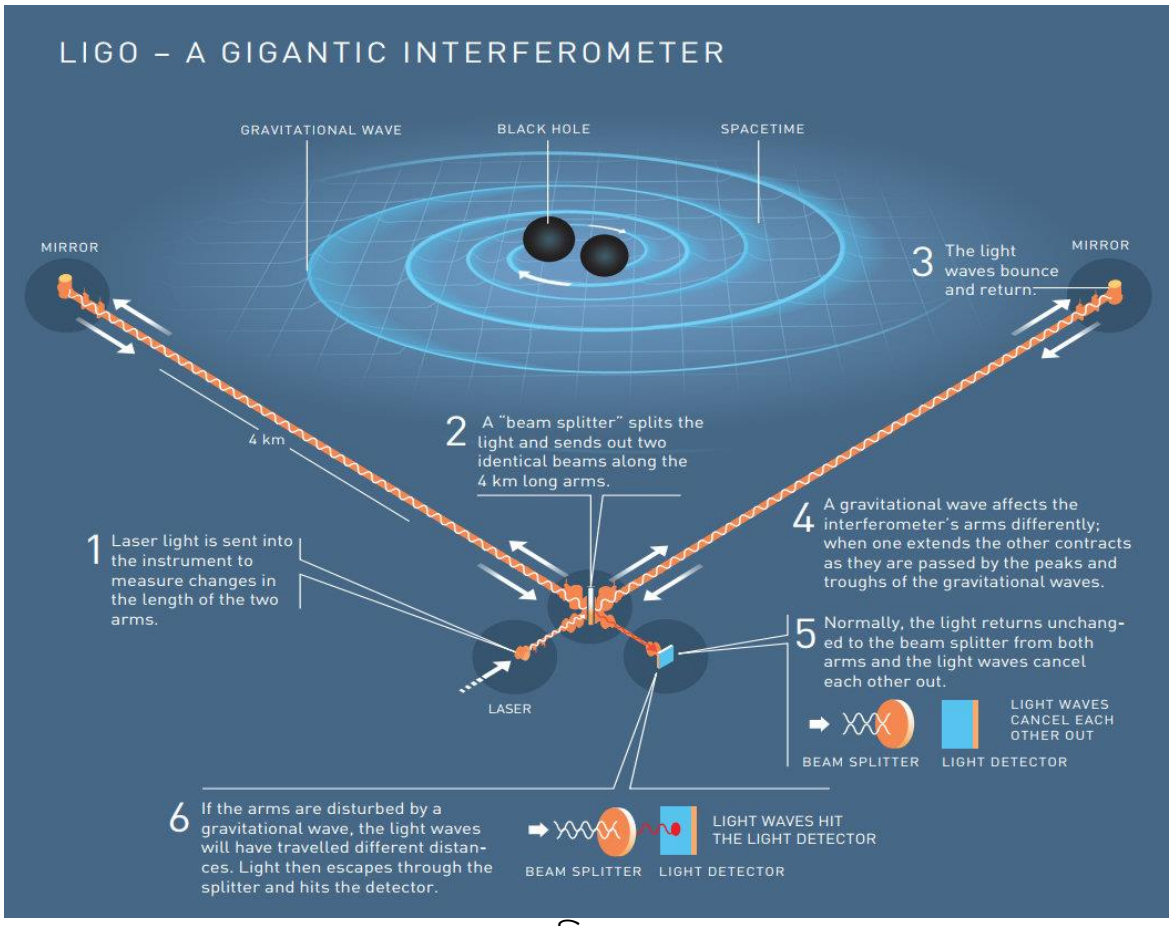

ছবি ১৪

Credit: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

কতটা শক্তিশালী ও সংবেদনশীল এই যন্ত্র ,তা বুঝতে কয়েকটি পরিসংখ্যান না দিলেই নয়। এই যন্ত্রের দুটি বাহুতে যে দুটি লেসার রশ্মি চলাচল করে তাদের দৈর্ঘ্যে যদি $১০^{-১৮}$ মিটার অর্থাৎ একটি প্রোটনের আকারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ পরিমান পরিবর্তন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে তা যন্ত্রে ধরা পড়ে যায়।শুধু তাই নয় বাইরের যে কোনো রকম কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক কারণ যেমন যানবাহনের চলাচল অথবা ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে তৈরী কোনো কম্পন কোনো রকম ভাবে যন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। লাইগো (LIGO) অব্জারভেটরি তাই সঠিক অর্থেই মানুষের তৈরি সবচেয়ে সংবেদনশীল যন্ত্র।

অবশেষে সে ধরা দিল:

অবশেষে আসলো সেই দিন যার অপেক্ষায় বিজ্ঞানীরা কাটিয়ে দিলো একশো বছর। ১৪ ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ লাইগো ,লিভিংস্টোনে ও হ্যানফোর্ডে ৭ মিলি সেকেন্ডের ব্যাবধানে একই রকম দুটি সিগন্যাল ধরা পড়লো। দুটি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কেউই প্রস্তুত ছিলেন না এই রকম আকস্মিক এক ঘটনার জন্য।বেশির ভাগ জন বিজ্ঞানী ভাবলেন এ বুঝি যন্ত্রের ত্রূটি কিংবা পরীক্ষার প্রয়োজনে কোনো কৃত্রিম কম্পন হয়তো প্রবেশ করানো হয়েছিল যার ফল স্বরূপ এরকম কোনো সিগন্যাল আসছে। কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। এইবার বিজ্ঞানী মহলে শোরগোল পরে গেলো। তড়িঘড়ি তারা বসে গেলো সিগন্যাল এর উৎস সন্ধানে র যেটা পাওয়া গেলো তা শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গান কেই মনে করিয়ে দেয় -"তোমার মহাবিশ্বে কিছু , হারায় নাকো প্রভু "

১৪০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে দুটি ব্ল্যাকহোলে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল ,তারা একে ওপরের চারপাশে পাক খেতে খেতে একসময় একে অপরের সাথে মিশে যায় আর বিপুল পরিমান শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার খবর ভেসে আসে পৃথিবীতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আকারে। এই তরঙ্গ পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় ১৪০ কোটি বছর।

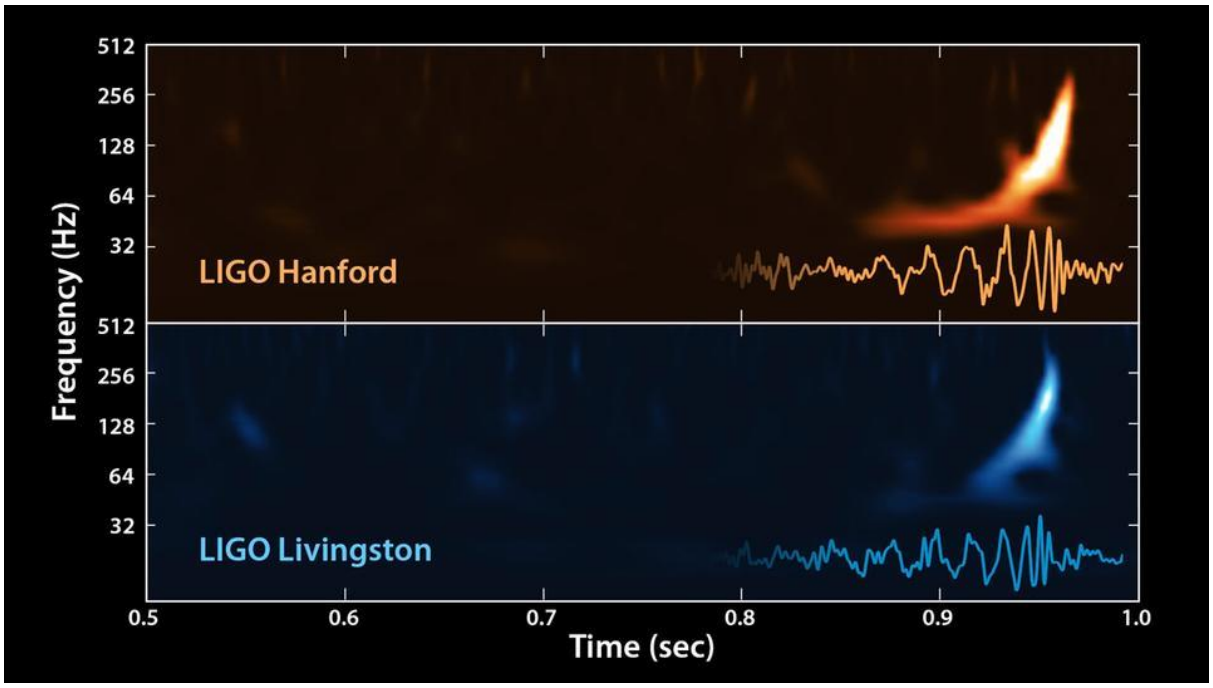

ছবি ১৫ - লাইগো যন্ত্রে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ এর রেখা চিত্র
Credit: Ringing chirp: the waveform of event GW150914, Caltech/MIT/LIGO Lab

যে দূরত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারিনা , মহাবিশ্বের কোনো সুদূর কোনো স্থান এর খবর ছড়িয়ে পরে দিকে দিগন্তে , কোনো কিছুই হারিয়ে যায়না এই বিশ্বে। চোখ বন্ধ করে একবার ভাবতে চেষ্টা করো, অপূর্ব অনুভূতিতে মন প্রাণ সিক্ত হয়ে যাবে। এই সিগন্যাল আমাদের আরো কিছু জানিয়ে গেলো , যেমন যে দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরের সাথে মিশেছিল তাদের একজন সূর্যের ভরের প্রায় ৩৬ গুণ ও অপরটি প্রায় ২৯ গুণ ভর সম্পন্ন। বিজ্ঞানীরা আরো জানালেন সিগন্যালটি ০.২ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল আর তার কম্পাঙ্ক ছিল ৩৫ থেকে ২৫০ হার্ৎজ। বিজ্ঞানীরা এই সিগন্যাল কে শব্দে পরিবর্তিত করে দেখেন সেটি অনেকটা ছোট্ট পাখির কিচির মিচিরের মতো তাই তারা এই সিগন্যাল টির নাম দিলেন চিরপ (Chirp)
বিশেষ উৎসাহী দের জন্য একটি Chirp নামের মোবাইল এপ্লিকেশন ও বানানো হয়েছে , যেখানে আমরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়ার আওয়াজ নিজের কানে শুনতে পারবো। তাহলে আর দেরি কেন, যাও শুনে নাও মহাবিশ্বের মহাসংগীত।

মধুরেণ সমাপয়েৎ:

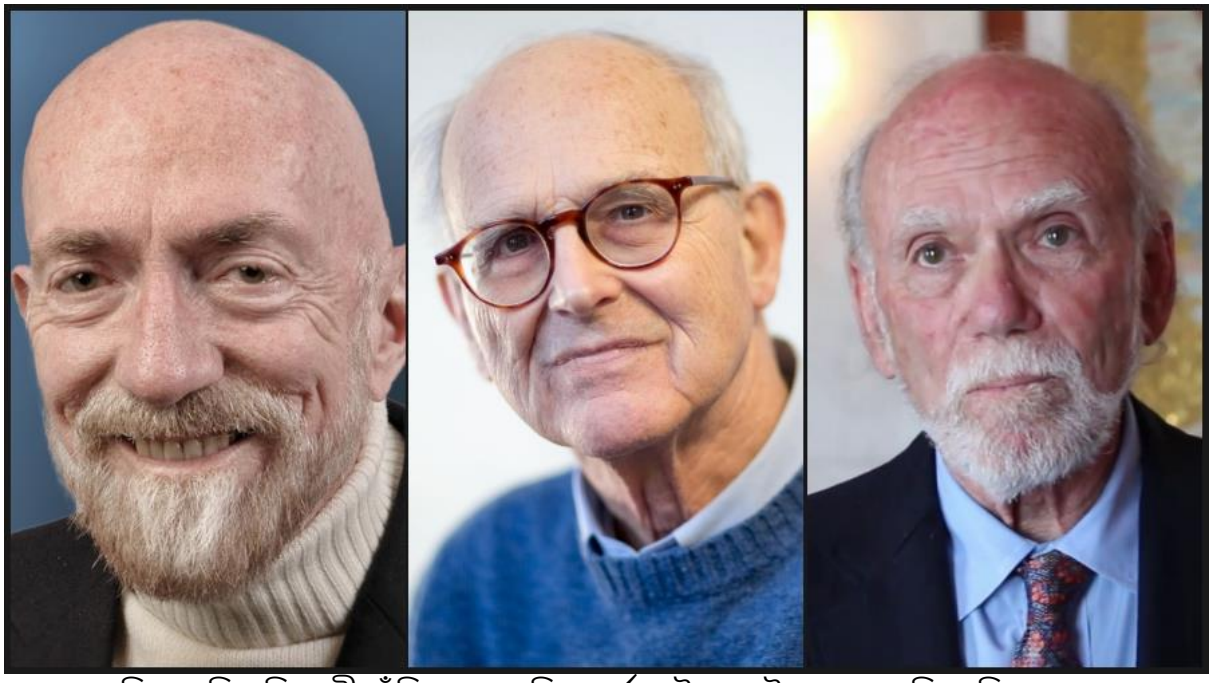

ছবি ১৬- তিন বিজ্ঞানী বাঁ দিক থেকে কিপ থর্ন ,রেইনার ওইস, এবং ব্যারি ব্যারিশ
Credit: Nobel Prize archives

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ওই তিন বিজ্ঞানী রেইনার ওইস, কিপ থর্ন এবং ব্যারি ব্যারিশ ২০১৬ সালে পদার্থ বিদ্যার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্ব স্বীকৃতি পেলো। যদিও একশো বছর লেগে গেলো তবুও সত্য সময় সময়েই সুন্দর আর যা সত্য তা মিলতে বাধ্য। কিপ থর্ন তাঁর নোবেল লেকচার দিতে গিয়ে বললেন সমস্ত মানুষের হয়ে আমি এই পুরস্কার , গ্রহণ করতে চলেছি , এ শুধু বিজ্ঞানের জয় আমি শুধুই একজন প্রতিনিধি। জয় হোক বিজ্ঞানের, জয় হোক মানুষের সত্য অনুসন্ধিৎসার।

আমরাও সামিল :

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে মহাবিশ্ব কে দেখার একটি নতুন দিকের সূচনা হলো। আর এই নতুন অন্বেষণ কে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের দেশও যোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষে তৈরী হতে চলেছে ইন্ডিয়ান গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অব্জারভেটরি বা ইন্ডিগো (IndIGO) .

LIGO INDIA

Credit: GW @ IUCAA > LIGO-India

এই অব্জারভেটরির কার্য ক্ষমতা আগের অব্জারভেটরি গুলির তুলনায় বেশি হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী মহল আমেরিকার ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় মহারাষ্ট্রের হিংগোলি জেলায় শুরু করতে চলেছেন এই বিরাট কর্মযজ্ঞ। এই যন্ত্রের সংবেদনশীলতা এতটাই হবে যে লেসার রশ্মির বাহুর দৈর্ঘ্যের $১০^{-২৩}$ মিটার অর্থাৎ, একটি প্রোটনের সাইজের লক্ষ ভাগের একভাগ পরিবর্তন ও এই যন্ত্রের দ্বারা ধরা সম্ভব হবে। সুতরাং স্বপ্ন দেখা শুরু করে দাও হয়তো এই কর্মকান্ডের হাত ধরেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা একদিন মহাবিশ্বের অনেক অজানা রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলবেন। আর যারা এখন ছাত্রছাত্রী আছো তোমরাও তো একদিন বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞে সামিল হতে পারবে।